North South University Library
1992

সা ক্ষা ৎ কা র

অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) উপাচার্য ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান। তিনি প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আবদুল হান্নান চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি এবং অপারেশনস রিসার্চে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ করেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম**

শিক্ষার প্রতিটি স্তর হওয়া উচিত আন্তঃসম্পর্কিত। কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ে নম্বর দিয়ে মেধা যাচাই না করে, শিক্ষার্থীদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে একে আরো উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের মেধাবী শিক্ষার্থী তার পছন্দের উচ্চতর বিদ্যায় অবদান রাখতে পারে

ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব এবং বেকারত্ব প্রসঙ্গে আপনার মূল্যায়ন কী?

এখানে উভয় পক্ষেরই ঘাটতি রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের সমস্যা সমাধানে একাডেমিয়ার কাছে আসার সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি। অন্যদিকে একাডেমিয়াও আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠতে পারছে না। এ সংকট কাটাতে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় 'ইন্টারন্যাশনালাইজেশন' বা আন্তর্জাতিকীকরণে জোর দিয়েছে। কারণ গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ছাড়া বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা অসম্ভব।

গবেষণার ক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের আন্তর্জাতিক কোলাবরেশন বা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন?

আমরা গত ১৫ মাসে পাঁচটি বিদেশী (তিনটি চীনা ও দুটি জাপানি) কোম্পানির ফান্ড আনতে পেরেছি। বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। উল্লেখযোগ্য কিছু প্রজেক্ট যেমন কানাডিয়ান ফান্ডিংয়ে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এবং আর্লি সুনামি রেসপন্স সিস্টেম নিয়ে গবেষণা চলছে। এটি স্যাটেলাইট ডাটা ব্যবহারের মাধ্যমে একটি প্রেডিক্টিভ মডেল হিসেবে কাজ করছে। এআই, মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে ঢাকার ট্রাফিক কনজেশন বা জ্যাম নিয়ে বিশ্লেষণ গবেষণা হচ্ছে। মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সেল ডিটেক্ট বা শনাক্ত করার কাজ চলছে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও ডায়রিয়া নিয়ে আইসিডিডিআর,বি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (যেমন জনস হপকিন্স, ইয়েল, কেমব্রিজ, ইউসি বার্কলে) সঙ্গে যৌথ গবেষণা চলছে।

বিদেশফেরত স্কলারদের কাজে লাগানো বা 'ব্রেইন ড্রেইন' রোধে আমাদের অবস্থান কেমন?

বাংলাদেশ নিজের দেশের মেধাবী হিউম্যান রিসোর্স বা স্কলারদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে খুবই 'আনওয়েলকামিং'। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামোয় বিদেশ থেকে আসা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে হুট করে নিয়োগ দেয়া কঠিন। অথচ চীন, তুরস্ক বা মালয়েশিয়া তাদের বিদেশফেরত স্কলারদের কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় গত কিছুদিনে বিদেশ থেকে ৩০-৪০ জন অভিজ্ঞ বাংলাদেশী গবেষক ও শিক্ষককে দেশে ফিরিয়ে এনে নিয়োগ দিয়েছে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেখানে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কড়াকড়ি করছে, সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা কেন দেশ ছাড়তে চাইছে?

এটি একটি রূঢ় বাস্তবতা যে আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করতে পারিনি। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা কাঠামোয় জ্ঞান অর্জনের চেয়ে 'সার্টিফিকেট' দেয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পার্ক করে রাখা হয় এবং শেষ পর্যায়ে একটি বিসিএস বা চাকরির আবেদনের যোগ্যতার সনদ দেয়া হয়। এতে মেধার বিকাশ ঘটে না। ফলে শিক্ষার্থীরা যখন দেখে যে দেশের ডিগ্রিতে তাদের প্রত্যাশিত ক্যারিয়ার গড়তে পারছে না, তখন তারা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করতে চায়। এমনকি জিওপলিটিক্স বা বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে উন্নত বিশ্বের দ্বার সংকুচিত হয়ে এলেও শিক্ষার্থীরা উপায় না দেখে প্রতিবেশী বা অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে।

'সার্টিফিকেট প্রডাকশন' বা সনদ তৈরির যে কথা আপনি বললেন, তার সমাধান কী?

আমরা অনেক সময় বড় বড় কথা বলি যে আমরা হাজার হাজার ফিলোসফার বা হিস্টোরিয়ান তৈরি করছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কি আসলে ওই সাবজেক্টের গভীরতা ধারণ করে? চার বছরের একটি প্রোগ্রামে প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা চেষ্টা করি শিক্ষার্থীদের অন্ট্রাপ্রেনরিয়াল জ্ঞান (উদ্যোক্তা হওয়ার শিক্ষা) দিতে। যেকোনো সাবজেক্টের শিক্ষার্থী হোক না কেন, তাদের অ্যাপটিটিউড লেভেল একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করা দরকার, যাতে তারা জীবনে যেকোনো পরিস্থিতিতে সফল হতে পারে।

পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এবং এদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আমাদের দেশে একটি ভুল 'ইকোসিস্টেম' তৈরি হয়েছে যে পাবলিক মানেই ভালো আর বেসরকারি মানেই খারাপ। আসলে আমরা ধনী বা গরিবের সন্তানকে পড়াই না, আমরা বাংলাদেশের নাগরিকের সন্তানদের পড়াই। দেশে ৫০টির বেশি পাবলিক এবং প্রায় ১৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু মানের দিক থেকে বিচার করলে উভয় ক্ষেত্রেই হাতেগোনা ১০-১৫টি ছাড়া বাকিদের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মান নির্ভর করে তার 'র ম্যাটেরিয়াল' এবং 'প্রসেস'-এর ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো গুণগত মানের শিক্ষক। আপনি যদি শিক্ষকদের মান এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রসেস ঠিক রাখতে পারেন, তবেই প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত হবে।

এত সমস্যার ভিড়েও আপনি কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আশাবাদী?

আমাদের তরুণ ও শিক্ষকদের নিয়ে আমি আশাবাদী। আমি দেখেছি, বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন স্ট্যানফোর্ড) থেকে পিএইচডি করা বা বিদেশে ২০ বছর শিক্ষকতা করা বাংলাদেশীরা এখন দেশে ফিরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। তারা উন্নত জীবনের মোহ ত্যাগ করে দেশের জন্য কাজ করতে আসছেন। আমাদের তরুণদের মধ্যেও অপার সম্ভাবনা আছে। শুধু দরকার তাদের হাত-পা বেঁধে না রাখা। যেমন কোনো মেধাবী ছাত্র যদি সাড়ে তিন বছরে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারে, তাকে চার বছর আটকে রাখা উচিত নয়। আমাদের সিস্টেমের এ জটগুলো খুলে দিলে এবং মেধাবীদের সঠিক নার্সিং করলে বাংলাদেশ অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াবে।

তরুণরা যারা ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আসবে, তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

তরুণদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিবর্তনের যে উন্মাদনা বা স্পৃহা দেখা যাচ্ছে, তা ইতিবাচক। তবে শুধু আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত 'হিউম্যান রিসোর্স' এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান। সাইবার সিকিউরিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শুধু দালানকোঠা বানালেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় না। আমাদের শিক্ষকদের যথাযথ ট্রেনিং দিতে হবে। একজন অনুপযুক্ত শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষক না থাকা বরং ভালো, কারণ ভুল শিক্ষা মেধা ধ্বংস করে দেয়।